বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্মৃতি
বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচী –২০১৩

ঃপরিচালনায়ঃ

বিজ্ঞান দরবার

৩৬/বি/৩ , গৌড় বাবু রোড, কাঁচরাপাড়া , উত্তর ২৪ পরগণা

মহাকর্ষ শব্দটাকে আগ্‌লে ধরে বলার চেষ্টা করা হয় — মানুষের উপর অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব আছে ; কিন্তু মহাকর্ষ সূত্র ও তার ব্যাখ্যা তা বলে না ।

রত্নপাথর ধারণের জন্য আলোকরশ্মির গুণের পরিবর্তন হয় যা মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের সহায়ক ; কিন্তু আলোক বা তরঙ্গ সম্পর্কিত সূত্রাবলী সে কথা বলে না ।

ভাগ্য ও কর্মফলের বিভিন্নতার জন্য হাতের রেখা আলাদা হয় ; কিন্তু জিনতত্ত্বের সূত্রাবলী সেকথা বলে না

বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখা করে পুরনো কুসংস্কারকে টিকিয়ে রাখার অপচেষ্টা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে । এসব তারই উদাহরণ ।

"চোখ রাঙালে না হয় গ্যালিলিও
লিখে দিতেন ঃ "পৃথিবী ঘুরছে না
পৃথিবী তবু ঘুরছে , ঘুরবেও
যতই তাকে চোখ রাঙাও না ।"

1. চোখ মেল্‌লেই রাশি রাশি বস্তু । জল, মাটি, বায়ু, পাহাড়-পর্বত , মহাকাশে তারা, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ, নিহারিকা, ধুমকেতু ইত্যাদি সব কিছুই বস্তু । এমনকি পৃথিবীর উপর মানুষ সহ এই বিশাল জীবজগৎ শেষ অর্থে বস্তু। একসময় মানুষ ভাবত অলৌকিক প্রক্রিয়ায় কোন সর্বশক্তিমানের দ্বারা এসব সৃষ্টি হয়েছে এবং সৃষ্টির পর আর কোন কিছুরই পরিবর্তন হয়নি । সৃষ্টিতত্ব বা Creationism- এর এটাই মূল কথা । পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ধর্মেরই মূল ভিত্তি এই সৃষ্টিতত্ব । তবে বিভিন্ন ধর্মে তা বিভিন্নভাবে রূপ পেয়েছে । বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ বস্তুজগতের এধরণের অপরিবর্তনীয়তা ও সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । কিন্তু নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রই প্রথম সৃষ্টিতত্ত্বের ভিত্ নড়িয়ে দিয়েছে । এরপর পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যার অনেক গবেষণা হয়েছে । এই সব গবেষণা থেকে আজ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং বস্তুজগতের অপরিবর্তনীয়তার ধারণার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

মহাকর্ষ সূত্র অনুযায়ী এই মহাবিশ্বে যে কোন দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বস্তু দুটির ভরের গুণফলের সমানুপাতীক এবং দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতীক । অতএব মহাবিশ্বের সব বস্তুর উপরই কিছু না কিছু বল ক্রিয়াশীল এবং এজন্য মহাবিশ্বের সব বস্তুই গতিশীল ।

মহাকর্ষের নিয়মে পৃথিবীর একটা আকর্ষণ বল আছে যাকে আমরা অভিকর্ষ বলি। পৃথিবীর উপর ধুলো-বালি, জীবজগৎ, বায়ুমন্ডল ও জল ইত্যাদি যেসব বস্তু আল্‌গাভাবে অবস্থান করছে তাদের প্রত্যেকের উপর পৃথিবীর অভিকর্ষের মান একইরকম। এজন্যই একই উচ্চতা থেকে যে কোন ভরের বস্তুকে ফেলে দিলে তা একই সময়ে মাটি স্পর্শ করবে । পৃথিবীর অভিকর্ষ উপরে অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু যত উপরে যাওয়া যাবে ততই অভিকর্ষের মান কমতে থাকবে। কোনো বস্তুর গতিবেগ যদি সেকেন্ডে 11.2 কি.মি. হয় তাহলেই কোন বস্তুর পক্ষে পৃথিবীর অভিকর্ষ বলয় অতিক্রম করে মহাকাশে প্রবেশ করা সম্ভব। অতএব পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে তারা সবাই পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের দ্বারা বাঁধা । বাঁধন মুক্তির একমাত্র শর্ত 11.2 কি.মি. / সে. বেগে উর্দ্ধগমন ক'রে অভিকর্ষ বল যতদূর বিস্তৃত ততদূর অতিক্রম করা । এই বেগকে এজন্য মুক্তিবেগও বলা হয় । এখন প্রশ্ন হল এই দূরত্বটা কত? মুক্তিবেগের সূত্র অনুসারে এই দূরত্বটা পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ঠিক অর্দ্ধেক, অর্থাৎ 3200 কি.মি. । অতএব পৃথিবীর চারপাশে 3200 কি.মি. বলয়ের মধ্যে যা কিছু থাক না কেন তারা সবাই পৃথিবীর সাথে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে । এদের কারো উপর অন্য কোনো গ্রহ, নক্ষত্র বা কোন মহাকাশ —উপাদানের আকর্ষণ বল একেবারেই কার্যকরী নয় । বিষয়টা আরও একটু ভাল করে বুঝে নেওয়া যাক্ । সমগ্র পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যেকার আকর্ষণ বলের মান 3.56×10^{12} নিউটন । পৃথিবীর উপর একজন মানুষের ভর ধরা যাক্ 50 কি.গ্রা তাহলে এই মানুষ এবং সূর্যের মধ্যেকার আকর্ষণ বল মাত্র 0.29 নিউটন। এখানে মানুষটির ভর ও তার উপর আকর্ষণ বল — কোনটিই বিচ্ছিন্ন বা নিরপেক্ষ নয় । মানুষটির ভর পৃথিবীর সমগ্র ভরের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র এবং একই কারণে 0.29 নিউটন পরিমাণ বল 3.56×10^{12} নিউটন বলের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং মানুষটি পৃথিবীর অংশ হিসেবেই ঘুরছে । অতএব সূর্যের

আকর্ষণ বল মানুষটির উপর একেবারেই কার্যকরী নয় ।

2. আলো বা আলোকরশ্মি এক অতি ক্ষুদ্র কণিকার স্রোত । এই কণিকাকে ফোটন বলা হয় । ফোটনের মধ্যে তড়িৎ ও চুম্বক উভয় ধর্মই রয়েছে । এজন্য ফোটনকে তড়িচ্চুম্বকীয় কণিকাও বলা হয়। ফোটন সরল গতিপথে চল্‌লেও গতিপথকে সরলরেখা বলা যাবে না। ফোটন কণিকাগুলি তরঙ্গ আকারে চলে । শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল এই যে আলোর কণিকা এবং তরঙ্গ উভয় ধর্মই আছে ।

এক সেকেন্ডে ফোটন যতগুলি তরঙ্গ বা কম্পন তৈরী করে তাকে বলা হয় কম্পাঙ্ক । অতএব একটা তরঙ্গের দৈর্ঘ্য দিয়ে কম্পাঙ্ককে গুণ করলে আমরা আলোর বেগ পেতে পারি । আমরা প্রতিদিন যে সূর্য্যের আলো দেখি তার ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $5896A^0$ ($1A = 10^{-8}$ cm) কম্পাঙ্ক 5×10^{14}। এই দুটো গুণ করলে আলোর বেগ দাঁড়ায় প্রায় তিন লক্ষ কি.মি.।

ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর আলোক রশ্মির প্রকৃতি নির্ভর করে। যে সব আলোক রশ্মির ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক মিটারের এক কোটি ভাগের সাতভাগের (7×10^{-7} মিটার) চাইতে বড় অথবা চার ভাগের (4×10^{-7} মিটার) চাইচে ছোট সেসব আলোক রশ্মিকে আমরা দেখতে পাইনা । 7×10^{-7} মিটারের চাইতে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ফোটন যে সব আলোর তাদেরকে অবলোহিত রশ্মি বলা হয় এবং 4×10^{-7} মিটারের চাইতে ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ফোটন যে সব আলোর তাদেরকে অতিবেগুনী রশ্মি বলা হয় ।

যে কোন আলোক রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও গতিবেগ নির্ভর করে কোনো মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের উপর। কোন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক যত বেশী হবে সেই মাধ্যমের মধ্যে কোন আলোক রশ্মির ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত কম হবে, কিন্তু কম্পাঙ্কের কোন পরিবর্তন হবে না, অর্থাৎ সেই মাধ্যমে আলোর গতিবেগ হ্রাস পাবে। যেমন সাধারণ সূর্যের আলোর কথা ধরা যাক্ । বায়ু বা শূন্য মাধ্যমে সাধারণ সূর্যালোকের ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $5896A^0$ এবং গতিবেগ সেকেন্ডে তিন লক্ষ কি.মি.। উল্লেখ্য, বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক এক (01)। কাঁচ মাধ্যমে সাধারণ সূর্যালোকের ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $3931A^0$ এবং গতিবেগ দু'লক্ষ কিমি । উল্লেখ্য, কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক 1.5 । হীরকের প্রতিসরাঙ্ক 2.5 । অতএব হীরকের মধ্যে এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে $2358A^0$ এবং গতিবেগ হবে এক লক্ষ কুড়ি হাজার কি.মি.। এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন কোন মাধ্যমের মধ্যে যতক্ষণ আলোকরশ্মি থাকবে ততক্ষণই এই পরিবর্তন । মাধ্যম থেকে আলোকরশ্মি বেরিয়ে গেলে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও গতিবেগ আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে । অতএব আলোকরশ্মি বায়ু মাধ্যমে চলতে চলতে যদি কাঁচ, হীরক, নীলা, পান্না, পোখরাজ, চুনী প্রভৃতি মাধ্যমে প্রবেশ করার পর কিছুক্ষণ পরে আবার বেরিয়ে গিয়ে বায়ু মাধ্যমে প্রবেশ করে তাহলে ঘন মাধ্যমগুলিতে যতক্ষণ আলো থাকবে ততক্ষণ পর্যন্তই আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও গতিবেগের পরিবর্তন স্থায়ী হবে । মাধ্যমে প্রবেশ করার আগে এবং মাধ্যম থেকে বেরিয়ে যাবার পর আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও গতিবেগের কোন পার্থক্য থাকে না ।

3. গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, শূকর, বাঘ, ভালুক, সিংহ, হাতি প্রভৃতি অজস্র

প্রভৃতি অজস্র জীব প্রজাতির বাসভূমি এই পৃথিবী। কোন প্রজাতির বৈশিষ্ট্যগুলি হুবহু অন্য কোন প্রজাতির সাথে মেলে না। এজন্যই গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, ইত্যাদিকে আমাদের চিনতে অসুবিধা হয় না।

আবার একই প্রজাতির দু'টি একক— জীবের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি একই রকম হলে অনেক একক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকে। যেমন ধরা যাক মানুষের নাকের কথা। নাক —এই বৈশিষ্ট্যটি প্রত্যেক মানুষের মুখমন্ডলের মধ্যরেখায় ঠিক দু'চোখের মাঝখানে অবস্থিত। কিন্তু কারো নাক টিকালো, কারো নাক চাপা, কারো নাক ভীষণই চাপা, কারো নাক দীর্ঘ, কারো নাক খাটো....ইত্যাদি।

এভাবে উচ্চতা, গায়ের রঙ, মুখমন্ডলের গঠন, হাতের রেখা, মাথার চুল, হাত-পায়ের চেটো ও আঙুল প্রভৃতি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষে মানুষে বিভিন্ন পার্থক্য রয়েছে। এজন্য রামকানাই ও শ্যামকানাইকে আলাদাভাবে চিনতে অসুবিধা হয়না। একমাত্র হোমোজাইগাস যমজদের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যগুলি প্রায় থাকে না বললেই চলে। মাতৃগর্ভে একেবারে শুরুতে একটা ভ্রূণ কোন কারণে দুটি অংশে বিভাজিত হলে দুটি অংশই ভ্রূণ হিসাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরিণতিতে একই রকম দেখতে দুটি শিশু জন্মগ্রহণ করে।এদের হোমোজাইগাস যমজ বলা হয়। এই ঘটনা খুবই বিরল।

এই যে আমরা জীব বৈশিষ্ট্যের এত ব্যতিক্রম এবং পরিবর্তনীয়তার কথা বলছি তার প্রধান কারণটা নিহিত রয়েছে কোষের জিন বা DNA অণুর মধ্যে। জিন বা DNA অণু হল ক্রোমোজোমের গঠন -একক। একটি প্রজাতির যে কোন কোষে কতগুলি ক্রোমোজোম থাকবে তা নির্দিষ্ট। যেমন একজন মানুষের যে কোন দেহকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা 23 জোড়া। অর্থাৎ পৃথিবীতে যত মানুষ বর্তমানে আছে, অতীতে ছিল বা ভবিষ্যতে আসবে তাদের সবার দেহকোষগুলিতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা 23 জোড়া ক্রোমোজোমগুলি একরকম নয়। প্রতিজোড়া ক্রোমোজোম পৃথক। এজন্য ক্রোমোজোমগুলিকে ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।

প্রতিটি ক্রোমোজোমে কতগুলি জিনের অবস্থান থাকবে সেটাও নির্দিষ্ট। ধরা যাক্ কোন মানুষের ৩ নং ক্রোমোজোম জোড়ার প্রত্যেকটিতে n সংখ্যক জিন থাকবে। n সংখ্যক জিন থাকার জন্য ক্রোমোজোমজোড়ার প্রত্যেকটিতে n সংখ্যক অবস্থান আছে। এই অবস্থানগুলিও নির্দিষ্ট কারণ প্রতিটি জিন অন্যান্য জিন থেকে পৃথক। এবার একটু গুছিয়ে বলা যাক্। ধরা যাক্ মানুষের শরীরে ইনসুলিন নামক হরমোনটি তৈরীর জন্য যে জিনটি দায়ী সেই জিনটি ৩নং ক্রোমোজোম জোড়ার প্রত্যেকটিতে পঞ্চম অবস্থানে থাকে। তাহলে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই বিষয়টা একইরকম হবে।

জীবদেহে যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারক ও পরিচায়ক হল জিন। একটি নির্দিষ্ট অবস্থানের জিনের মধ্যে কখনও কখনও বিভিন্ন কারণে পরিবর্তন ঘটতে পারে। একে জিন মিউটেশন বলে। মিউটেশনের জন্য বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন ঘটবে। যদি পরিবর্তনটি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক হয় তাহলে পরিবর্তনটি টিকবে না, কিন্তু ক্ষতিকারক না হলে বা প্রয়োজনীয় হলে পরিবর্তনটি টিকে থাকে। এভাবে

বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটতে পারে । বাস্তবে এরকম অনেক পরিবর্তনের অস্তিত্ব রয়েছে মানুষের মধ্যে । বংশগতির নিয়মে পরিবর্তনগুলি ছড়িয়ে পড়ে ।

মিয়োসিস কোষ বিভাজনে একটি কোষ বিভাজিত হয়ে মোট চারটি জনন কোষ বা গ্যামেট তৈরী হয় । এই প্রক্রিয়া চলাকালীন পাশাপাশি দুটি অপত্য ক্রোমোজোমের মধ্যে জিনের আদান-প্রদান ঘটে থাকে ক্রসিং-ওভার ও লিংকেজ বলে । এই প্রক্রিয়াও জিনগত পরিবর্তনকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয় ।

অনেক সময় আমরা মানুষের বিভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্যকে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা ভাগ্যের কারণ হিসেবে কল্পনা করি । বাস্তবে দুইয়ের মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই । একটি মানুষের চরিত্র কেমন হবে বা তার ভাগ্য কেমন হবে তা অনুসরণ করে জিনগত পরিবর্তন ঘটেনা । জিন মিউটেশন নির্ভর করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের উপর যাদেরকে একত্র বলা হয় মিউটাজেন । কোন জিনে কখন মিউটেশন ঘটবে বা ঘটতে পারে তা আগাম বোঝার কোনো উপায় নেই । প্রক্রিয়াটি এলোপাথারী । বিপরীতে চারপাশের সামাজিক পরিবেশের প্রভাব একটি মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রধান নির্ণায়ক ।

4. মানুষের মধ্যেকার পারস্পারিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হলে সময়ের হিসেবটা খুব জরুরী। ধরা যাক্ 90 দিন বাদে সোমেনকে একশ টাকা দেবার জন্য রমেন অঙ্গীকারবদ্ধ। এখন দিন গুণে গুণে যদি রমেন ও সোমেনকে নব্বইতম দিনে পৌঁছাতে হয় তাহলে ভুল হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক । একজন যে দিনটাকে নব্বইতম দিন বলবে , দ্বিতীয়জন হয়ত তাকে আশিতম দিন বলবে । রমেন-সোমেনের চুক্তির কথা মাথায় রেখে সমাজের অন্যান্য মানুষরাও দিন গুণে গুণে চলবে সেটাও সম্ভব নয় । এর চেয়ে ভাল বছর, মাস ও তারিখের ব্যবস্থা যা সবাই একই সাথে জানবে ।

প্রাচীন ভারতের মানুষ এই সমস্যা -সমাধানে হাতিয়ার করেছিল আকাশ পর্যবেক্ষণকে। গ্রহ, উপগ্রহ, তারা, নক্ষত্র প্রভৃতির অনেক বৈশিষ্ট্য মানুষের চোখে ধরা পড়তে লাগল। যেমন, চাঁদকে প্রতিদিন আকাশের এক জায়গায় দেখা যায় না, তবে মোটামুটি ৩০ দিন বাদে একই জায়গায় দেখা যায় ; কোন একটি বিশেষ নক্ষত্র প্রতিদিনই একটু একটু করে স্থান পরিবর্তন করে, কিন্তু 365 দিন বাদে ওই নক্ষত্রটিকে আবার একই জায়গায় দেখা যায় ; সূর্যকে প্রতিদিন সকালে পূর্ব আকাশে দেখা যায় এবং প্রতি মুহূর্তে একটু একটু করে পশ্চিম দিকে সরতে সরতে একসময় একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় .... ইত্যাদি । আজকে আমরা যাকে জ্যোতির্বিজ্ঞান বলি, প্রাচীন মানুষরা আকাশ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তারই চর্চা তথা গবেষণা শুরু করেছিল। এটা যে শুধু প্রাচীন ভারতেই ঘটেছে তা নয় । পৃথিবীর যেখানে যেখানে মানুষের সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল সেখানেই এভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছিল। এই গবেষণার ফলে প্রাচীন মানুষ দিন-রাত, তিথি, পক্ষ, মাস, বছর, ঋতু-চক্র প্রভৃতির হিসেব যথেষ্ট ঠিকঠাকভাবে করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলতঃ সমস্যাও অনেকটাই মিটে গিয়েছিল।

সময়ের হিসেব মেটাতে গিয়ে পৃথিবীর ঘূর্ণন নিয়ে একটা ভুল সিদ্ধান্ত তৈরী হয়ে গেল। পৃথিবীর উপর অবস্থান ক'রে, পৃথিবীটা যে ঘুরছে তা স্বাভাবিকভাবে

বোঝা সম্ভব নয় । সে যুগে অন্য কোন উপায়ও ছিল না। বরং সূর্যটা প্রতিদিন পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্তে এগোতে এগোতে একসময় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—এটা নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করে পৃথিবীকে স্থির ভাবা এবং পৃথিবীর চারিদিকে সূর্যের পরিক্রমণকে ভাবা অনেক সহজ । প্রাচীন মানুষরা সেটাই ভেবেছিল এবং সিদ্ধান্ত করেছিলেন এক ভূ-কেন্দ্রিক মহাবিশ্বের —' মহাবিশ্বটা গোলকের মত, এর কেন্দ্রে স্থির হয়ে আছে পৃথিবী। পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে সমস্ত তারা, নক্ষত্র , গ্রহ, উপগ্রহ।"

পর্যবেক্ষণের সীমাবদ্ধতার কারণে একসময় জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চায় নানা ধরণের কাল্পনিক ধারণা অন্তর্ভূক্ত হতে শুরু করে । এই সব কাল্পনিক ধারণাগুলির মধ্যে—মানুষের উপর গ্রহ, নক্ষত্রের প্রভাব, জন্ম মূহূর্ত্তে বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান, রাহু ও কেতু নামে দুই গ্রহের অস্তিত্ব, গ্রহের কুপ্রভাব প্রতিকারে রত্ন ধারণ ইত্যাদি খুবই উল্লেখযোগ্য। আজকের যুগে কোন ধারণা বা প্রকল্প খুব বেশীদিন প্রকল্প হিসেবে টিকে থাকতে পারে না। হয় তা প্রমাণিত হয়ে সূত্র বা তত্ত্বে পরিণত হবে, নয় তা অপ্রমাণিত হয়ে বর্জিত হবে । সে যুগে প্রমাণ বা অপ্রমাণ —কোনটা করারই সুযোগ ছিল না। এইজন্য এই সব কাল্পনিক ধারণাগুলির চর্চা ও অনুশীলন হতে হতে একসময় সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে যেত । ভূকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণাকে কেন্দ্র-বিন্দুতে রেখে এই সব কাল্পনিক ধারণাগুলিই জ্যোতিষবিদ্যার মূল বিষয় । সে যুগে এইসব কাল্পনিক ধারণাগুলির সত্যাসত্য প্রমাণ করার কোন উপায় না থাকলেও আজ তা যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে । গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব , রত্নপাথর ও হস্তরেখা ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে । অবশিষ্ট ধারণাগুলিও নিছকই কল্পনা। রাহু ও কেতু নামে আদৌ কোন গ্রহ বা নক্ষত্রর অবস্থানই নেই। রাহু-কেতু আসলে মহাকাশে দুটি কাল্পনিক বিন্দুমাত্র যে বিন্দুতে অবস্থান করলে সূর্য বা চন্দ্রের গ্রহণ হয়।

ভূ-কেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণাও বর্তমানে অপ্রচলিত । কোপার্নিকাস সর্বপ্রথম বলেন যে পৃথিবী সহ অন্যান্য গ্রহরা সূর্যের চারিদিকে আবর্তন করে। কোপার্নিকাসের মৃত্যুর পর তাঁর এই বক্তব্য প্রকাশ পায়। জিওদার্ণো ব্রুণো কোপার্নিকাসের এই বক্তব্য প্রচার করতে গিয়ে গীর্জা এবং ধর্মযাজকদের রোষানলে পড়েন। ধর্মযাজকরা ব্রুণোকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে। এরপর গ্যালিলিও টেলিস্কোপ আবিষ্কার করে প্রমাণ করে দিলেন পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য ঘোরে না, বরং সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী সহ অন্য গ্রহরা ঘোরে । ধর্মযাজকরা গ্যালিলিওর টেলিস্কোপ দিয়ে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে । এখানেই শেষ নয় । জহ্লাদ ধর্ম যাজকরা গ্যালিলিওর বিচার শুরু করে। মৃত্যুভয়ে নিজের সৃষ্ট মতবাদকে অস্বীকার করা সত্বেও ধর্মযাজকরা তাঁকে আজীবন কারাবাসের শাস্তি দেয় ।

এসব অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধের ঘটনা। গ্যালিলিওর মৃত্যুর পর খুব বেশীদিন লাগেনি সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে । এখন মহাকাশবিদ্যা আরও অনেকদূর এগিয়ে গেছে । মহাকাশে কেউ স্থির নেই। প্রত্যেক গ্রহ, তারা, নক্ষত্র কারো না কারো চারিদিকে আবর্তন করে ।

মূদ্রণে ঃ জ্যোৎস্না আর্ট প্রেস, হালিসহর চৌমাথা বাজার , মোঃ ৯৮৮৩২৪৬৫৯৮